সিরাজগঞ্জে নজরুলের ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা এবং নজরুলের "যৌবনের ডাক"

অভিভাষণ ঃ

নজরুলের কবিতা, গান ও সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে যে শক্তি সর্বদা কাজ করেছে তা তাঁর যৌবন এবং সমকালে তরুণদের উৎসাহ এবং প্রেরণা। তাঁর লেখনির প্রকাশে অন্যান্য পত্রিকা সহযোগিতা করলেও মাসিক ও সাপ্তাহিক সওগাত পত্রিকা এক্ষেত্রে তাঁকে সর্বাধিক সহযোগিতা করেছে। বস্তুত: সওগাত পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সে সময়ের শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যমণি হিসেবে নজরুল সাহসিকতার সাথে কাজ করতে পেরেছিলেন। এই যুব সম্প্রদায় ছিলেন তাঁর প্রেরণা, তাঁর লেখার হিতৈষী। 'সওগাত' কে কেন্দ্র করে তৎকালীন মুসলমান যুব সমাজ একত্রিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নজরুল এই তরুণদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং এ সময়ে তাঁর প্রদত্ত যুবকদের উপলক্ষে ভাষণ, তাঁর কবিতা ও গানের মতই অমর সৃষ্টি। দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও তিনি কবিতা ও গানের সৃষ্টিতে যেমন ক্লান্তবোধ করেননি, তেমনি তাঁর এ সব ভাষণে তিনি তাঁর দুঃখবোধকে ভুলে জাতীয় সমস্যাকেই বড় করে দেখেছেন।

নজরুল সৈনিক হয়েছিলেন তারুণ্যের বশবর্তী হয়ে। এই সৈনিক জীবনে তিনি রুশবিপ্লবের কথা শুনে অনুপ্রাণিত হন। কবিতা ও গানের চর্চা বাল্যকালেও হলেও প্রথমে সৈনিক জীবনে এবং তার পরবর্তীকালে লেখাকেই নজরুল পেশা করে নিয়েছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাল্যকাল থেকেই তিনি বিরোধী ভাবাপন্ন ছিলেন। তবে সাধারণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না। বাল্যকালেই বেশ কয়েকজন ইংরেজকে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছেন। তিনি সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসেই নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। তাঁর কাব্যে, গানে, উপন্যাসে এবং ছোটগল্পে মানুষের কর্মকাণ্ডের পরিচয় রয়েছে। নজরুল কখনই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। কিন্তু জন্মসূত্রে মুসলমানদের অধ:পতন তাঁর চোখে পড়েছে এবং তাদের উন্নতি তিনি আন্তরিক ভাবে কামনা করেছেন অতীতের ঐতিহ্যের সূত্র ধরে। অনিবার্যভাবেই মুসলিম চেতনা তাঁর সে সময়ের কাব্যে রূপ পেয়েছে। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁকে কখনও পছন্দ করে নি, যেমন পছন্দ করে নি গোঁড়া হিন্দু সমাজও। 'শ্যামাসঙ্গীতে' লিখেও তিনি তাদের মন পাননি। এমনকি

হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেও এক শ্রেণীর হিন্দুদের মন জয় করতে পারেন নি। তারা এ বিয়েকে ভাল চোখে দেখেনি। তাঁর লেখায় হিন্দু-মুসলিম শব্দ বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। কেন তিনি তা করেছেন; এর জবাবে তিনি বলেছেন, সাহিত্য অসাম্প্রদায়িক। ভাষাও অসাম্প্রদায়িক। ব্যবহৃত শব্দে ধর্মের পরিচয় থাকলেও ভাষাকে শক্তিশালী ও গতিশীলতার জন্যে তিনি তা করেছেন। প্রথমদিকে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মুসলিম ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং মুসলমানেরা তাঁকে তাদের অগ্রযাত্রার নৈয়ায়িক হিসেবেও পেয়েছেন। এ সবই তাঁকে মুসলিম সম্প্রদায়ের খুব কাছের মানুষ করে নিয়েছিল। মুসলিম তরুণদের নানা সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছেন, বক্তব্য রেখেছেন। এসবের মধ্যেও তাঁর বক্তব্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা খুব জোরালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ইসলাম ধর্মকে সকল মানুষের ধর্ম বলে জেনেছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (স:) সমগ্র মানুষের জন্যই এসেছিলেন। কোরআন ও হাদীসে তারই প্রকাশকে তিনি লক্ষ্য করেছেন। তিনি কখনও ধর্মান্ধতায় ভোগেননি বরং যারা ধর্মান্ধ তাদের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছেন। মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন "সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম" এই নামে যে গ্রন্থ লিখেছেন সেখানে তিনি নজরুলের সঙ্গে তৎকালীন তরুণ সমাজের গভীর সম্পর্কের এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর এই বিবরণ থেকে যা আমরা জানতে পারি তা হলো: ১৯৩২ সালের ৫ ও ৬ই নভেম্বর তারিখে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে নজরুল সভাপতি ছিলেন। সভাপতি হিসেবে তাঁর বক্তব্যকে নজরুল 'যৌবনের ডাক' নামে সওগাত পত্রিকায় ছাপাতে দেন এবং ১৩৩৯ সালের কার্তিক সংখ্যায় তা ছাপা হয়। নজরুলের এই বক্তব্য সে সময় দারুণ আলোড়ন এনেছিল। এখন অবধি তাঁর এই বক্তব্য অমলিন রয়েছে এবং তরুণদের কাছে আজও তা প্রেরণার উৎস। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সিরাজগঞ্জ সম্মেলনের সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল হককে নজরুল তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে যে চিঠি লেখেন তা নিম্নরূপ:

জনাব সম্পাদক সাহেব,

তসলিম। আপনাদের নেতা আসাদউদ্দৌলা সিরাজী মারফৎ আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ পেলাম। যে সময় সারা বাংলাদেশ আমার বিরুদ্ধে, সেই সময় এই বিদ্রোহীকে আপনারা তরুণদের পথ প্রদর্শকের জন্য ডেকেছেন। ধন্য আপনাদের সাহস। 'ধুমকেতু'র সারথীরূপে নয়,– যুদ্ধের ময়দান হতেই তারুণ্যের নিশান বরদার আমি। তাই ছুটে এসেছি দেশবাসীর পাশে। আজাদী অনাগত– তারই আগমনী গাওয়া ও তা হাসিল করাই বিপ্লবী প্রাণের লক্ষ্য। আপনারা লক্ষ্য পথে যাত্রা করুন। কোন বিঘ্নই সে পথে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। দেশ গোলামীর জিঞ্জির হতে মুক্ত হোক। মুক্ত প্রাণে, মুক্ত বাতাসে যেদিন মুক্তির গান গাইতে পারব, সেইদিন হবে আমার অভিযানের শেষ। আপনারা জনকয়েক তরুণ আমার সহযাত্রী হচ্ছেন। এজন্য আমি একান্ত আশান্বিত। আজ যদিও চারিদিকে বিভীষিকা– অনাদর, অকৃতজ্ঞতা দেখা দিয়েছে–– তবুও পিছপা

হবার কিছু নেই। প্রতিভা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, ত্যাগ ও সাধনার মূল্য একদিন সমাজ দিবেই। গায়ক আব্বাস উদ্দীনও আপনাদের আমন্ত্রণ কবুল করেছেন। ইনশাল্লাহ এই নভেম্বর ভোরের ট্রেনে সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশনে পৌঁছাব। --নজরুল।"

এই ছোট চিঠিতে নজরুল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। আজীবন তিনি স্বাধীনতার কথা তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন। এদেশ থেকে বৃটিশদের যেমন উৎখাত করতে চেয়েছেন তেমনি মুসলমানদেরকে সকল কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতেও তাগিদ দিয়েছেন। বলতে কি, কবি সাহিত্যিকদের মধ্যেই তিনি সর্বপ্রথম 'ভারত স্বাধীন' হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

নজরুলের সিরাজগঞ্জ গমনের একটি প্রতিবেদন সেদিন 'জাগরণ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এখানে তার বিবরণ দেওয়া হল:

কবি এবং আব্বাসউদ্দিনকে নিয়ে যাবার জন্য সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজী কলকাতায় এসেছিলেন। ৫ই নভেম্বর ভোরে তারা পৌঁছুলেন সিরাজগঞ্জ স্টেশনে। বাইরে প্রচণ্ড শীত। অথচ সেই শীতকে উপেক্ষা করে সাত-আট হাজারের এক বিরাট জনতা কবিকে স্বাগত জানাবার জন্যে নীরবে অপেক্ষমান। খদ্দরের পাজামা, খদ্দরের শেরোয়ানী, খদ্দরের সাদা টুপি আর খদ্দরের উত্তরীয়, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বলিষ্ঠ দেহে অপূর্ব সাজ নজরুলের।

কবি নামলেন গাড়ী থেকে। বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। পুরনারীগণ চন্দন-পুষ্প নিয়ে পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান। গাড়ী সামান্য একটু পথ এগিয়েই থেমে যায়। পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হয়, দু'দিক থেকে। এমনি করে সারা শহর ঘুরিয়ে তাঁদের যখন মোক্তার আফজাল আলী খাঁর বাসভবনে নিয়ে আসা হ'ল তখন দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে। দুপুর একটার সময় আব্বাসউদ্দীনের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ আরম্ভ হ'ল। বিশাল জনতা। গোটা শহর বুঝি ভেঙ্গে পড়েছে। কোথাও তিল ধারনের জায়গা নেই। আব্বাসউদ্দীন সুরের যাদু দিয়ে জনতার হৃদয় দুলিয়ে দিলেন আর সেই হৃদয়ে আগুন জ্বালালেন নজরুল। তাঁর বাণীতে সেদিন বুঝি আগুন ঝরছিল। নিখিল বাংলার তরুণদের ডাক দিলেন বিপদ-বাধা দলে এগিয়ে চলার জন্য।

সঙ্কল্প তাঁর বন্ধন-মুক্তির- স্বাধীনতার। সেদিন বিশাল জনতার সম্মুখে নজরুল যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, মনে হয় সেটি ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিভাষণ। এই একটিমাত্র অভিভাষণে নজরুলের সমগ্র জীবনাদর্শ বিধৃত হয়ে আছে।"

বস্তুত: নজরুলের সিরাজগঞ্জে আগমন এবং সেদিনের আম-জনতার অংশ গ্রহণে যে শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন তিনি পেয়েছিলেন তাতে পুরুষের পাশে নারীদের অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মতো। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন কবিকে এমন বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে তার কোন রেকর্ড নেই। নজরুলের এই জনপ্রিয়তাকে বৃটিশ ভয়

করেছে। তৎকালীন নজরুলের বিরুদ্ধবাদী রাজনীতিকগণ শঙ্কিত হয়েছেন। এমন সংবর্ধনা কেবল দেশবরেণ্য মানুষ, রাজাদের ভাগ্যেই জোটে। নজরুল ছিলেন বাংলাদেশের মুকুটহীন রাজা এবং জনগণ মন নন্দিত এক মহান কবি। সিরাজগঞ্জে সেদিন যে অভিভাষণ তিনি দিয়েছিলেন তা ছিল একটি ঐতিহাসিক দলিল। এই অভিভাষণের মাধ্যমে নজরুল সেদিন যেমন তাঁর নিজেকে ব্যক্ত করেছিলেন তেমনি সেদিনের মুসলিম সমাজ যাদের বিরাট ধর্মান্ধতার কারণে গোটা জাতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, যাঁদের গোড়ামী মুসলিম সমাজের উন্নতির মূলে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, মুসলিম নারীদের যারা দাসী বানিয়ে গৃহের অভ্যন্তরে অবরোধ করে রেখেছিল, শিক্ষার আলো যাদের কপালে জোটেনি এবং যারা এই নারী শিক্ষার অন্তরায় এবং বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল-- নজরুল তাদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিভাষণে আগুন ছড়িয়েছিলেন। সেদিনের সেই আগুন বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সিরাজগঞ্জের এই অভিভাষণ তাই মুসলিম জাগরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

নজরুল তাঁর কাব্যে 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় যে কথা বলেছিলেন, এখানে সেই কৈফিয়তের পাশাপাশি আর একটি বক্তব্যে যে বাণী তিনি দিলেন গোটা জাতিকে, আবেগ এবং মর্মস্পর্শিতার এমন অবিস্মরণীয় বাঙময় প্রকাশ অন্য কারো লেখনিতে তা বিম্বিত হয়নি। কি অসাধারণ বাক-কৌশল, কি দীপ্তিমান ভাব-ভাষার অপ্রতিরোধ্য গতি, সেদিনের সিরাজগঞ্জ মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবাক বিস্ময়ে কবির মুখনিসৃত সেই বাণীকে প্রাণমনলয়ে গ্রহণ করেছিল। সেদিন সিরাজগঞ্জ ছিল গোটা বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ সকলে মিলে এক মহানায়কের এক মহৎ অভিভাষণের সাক্ষী হয়েছিল। তাঁর এই অভিভাষণ বাঙালী জীবনের যে পথনির্দেশনা দিয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমন সাহসী বক্তব্য আর কখনও দেখা যায়নি। নজরুলই সেদিন পেরেছিলেন, 'আমাদের ঘা দিয়ে বাঁচতে সাহায্য করতে। বাংলায় নজরুলকে নিয়ে সেদিন যারা কুৎসিত রটনায় লিপ্ত ছিলেন, এই অভিভাষণ ছিল তাদের জন্য এক বিরাট চপেটাঘাত। আমরা 'সওগাত' পত্রিকাকে ধন্যবাদ জানাই এই বক্তব্য ছাপিয়ে দেবার জন্য। সেদিনের 'সওগাতে'র এই সাহসী ভূমিকাও বাঙালী কখনও ভুলবে না।

নজরুলের এই অভিভাষণ তাঁর সমকালে নিশ্চিতভাবেই নজরুলের বিরুদ্ধবাদী মৌলভী সাহেবেরা পড়েছিলেন। একটি জাতির পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবার এই আহবান নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। যেসব মুসলমার নামধারী কুপমন্ডুক মৌলভী সাহেবেরা সেদিন নজরুলকে 'কাফের', 'শয়তান' ইত্যাদি বলে 'নরাধমের' পর্যায়ে নিতে চেয়েছিলেন, এই অভিভাষণ পাঠ করে তাঁরা নিজেরাই চরম আত্মগ্লানিতে ভুগেছিলেন। কবি গোলাম মোস্তফা, মাওলানা আকরাম যাঁর মতো অনেকেই সেদিন অনুতপ্ত হয়ে নজরুলকে মুসলিম জাতির অগ্রনায়ক হিসিবে গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে মিথ্যার অবমান হয়ে থাকে এবং সত্য জয়দীপ্ত হয়।

॥ দুই ॥

বলেছি, নজরুলের সিরাজগঞ্জের 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের অভিভাষণ একটি ঐতিহাসিক এবং দিক নির্দেশনামূলক চেতনার বহি:প্রকাশ ছিল। সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে নজরুলের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বি। এই সম্মেলনে তরুণদের উদ্দেশ্য করে সেদিন তিনি যা বলেছিলেন, তা ছিল পিছিয়ে পড়া একটি জাতির জন্য সাহসী নির্দেশনা ও তাঁর এই অভিভাষণ ছিল সর্বকালের একটি অনন্য অভিভাষণ। মুসলিম তরুণদের লক্ষ করে এই অভিভাষণ দেওয়া হলেও তা সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেনি। মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই নজরুল সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছিলেন। হিন্দুরা সমালোচনা করলেও এক শ্রেণীর মুসলমানদের মতো কেউ তাঁকে 'কাফের' 'শয়তান' কিংবা 'জাহান্নামী' এমন আখ্যা দেয় নি।

এই অভিভাষণের শুরুর একস্থানে তিনি বলেন: "আমি কবি। বনের পাখির মত স্বভাব আমার গান করার। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স-ফিঙে যখন বেচারা গানের পাখীকে তাড়া করে, তীক্ষ্ম চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছে হইতে উড়িয়া আন-গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, কান্নায় গান। সে গান করে আপনার মনের আনন্দে; যদি তাহাতে কাহারও অলস তন্দ্রা মোহনিদ্রা টুটিয়া যায়; তাহা একান্ত দৈব। যৌবনের সীমা পরিক্রমণ আজও আমার শেষ হয় নাই, কাজেই আমি যে গান গাই, তাহা জীবনের গান। তারুণ্যের ভরা-বাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে, তাহা আমার অগোচরে। যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায়, সে হয়তো তাহার শক্তি সম্বন্ধে না ওয়াকিফ।'

উপরোক্ত বক্তব্যে নজরুল তাঁর নিজের জীবনের কথাই বলেছেন। তাঁর উপর যে আঘাত এসেছিল, কাব্যিক ভাষায় তিনি তার চমৎকার জবাব দিয়েছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। কিন্তু পাখী গান গায়, ফুল ফোটে নিজের আনন্দে, তবে তা শুধু নিজের জন্যেই নয়, অন্যেও তা থেকে আনন্দ পেয়ে থাকে। এখানে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছেটা আমাদের বুঝতে হবে। পাখীর গান অন্যকে আনন্দ দেবে এবং তার গানে অপরের ঘুমও ভাঙবে এমন ইচ্ছে সৃষ্টিকর্তার থাকতেই পারে। একটা প্রবাদ আছে :

"আপনাকে লয়ে বিব্রত হতে আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

এটাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। নজরুল কি নিজের জন্যেই কবিতা লিখেছিলেন– তা নয়। তবে একজন কবির দায়িত্ব সমাজ সংস্কারকের নয়– এটা সত্য। কিন্তু সমাজ সংস্কারের কথা যে সেখানে থাকবে না এমনটাও হতে পারে না। হয়নিও কখনও।

নজরুল তাঁর এই ঐতিহাসিক ভাষণে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেছেন–– যা শাশ্বত সত্য। এক্ষেত্রে তিনি বার্ধক্য ও যৌবনকে তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সাধারণত বার্ধক্য বলতে যা বোঝায় তাঁর একটি চমৎকার ও ভিন্ন ব্যাখ্যা তিনি

দিয়েছেন। এই বার্ধক্য যৌবনের শত্রু। তিনি বলেন: "বার্ধক্য তাহাই– যাহা পুরাতনকে– মিথ্যাকে মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন। নবমানবের অভিনব জয়যাত্রার যাহারা শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানেনা–– পারে না। যাহারা জীব হইয়াও জড়, যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণ-স্তুপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই– যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাৎ করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতি-জ্ঞানের অগ্নিমান্দে যাহারা আজ কঙ্কালসার– বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি–– যাহাদের যৌবনের উর্দ্দীর নীচে বার্ধক্যের কঙ্কালমূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি– যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণবিবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন।"

কি অসাধারণ বিশ্লেষণ! নজরুল তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলিম জাতির তথাকথিত বয়োবৃদ্ধ মানুষদের কথা বলেছেন, যাঁরা নিজেদেরকে জ্ঞানী বলে ভেবে মিথ্যাকে আশ্রয় করে জীবনের সব ভালো কিছুকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। সমাজের উন্নতিকে থামিয়ে দিয়ে, পুরাতনকে- মিথ্যাকে আঁকড়িয়ে ধরে সমাজের গতিকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এই বক্তব্যে নজরুল তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি বার্ধক্য ও যৌবনের এক চমৎকার নতুন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যা অভিনব। নজরুলের এই বক্তব্য ভিক্টোরিয়ান কবি টেনিশনের In memorium কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে কবি মৃতকে, পুরাতনকে অস্বীকার করে, চির যৌবনকে আবাহন করেছেন। টেনিশনের ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন : Ring out the old Ring in the New. Ring happy bells across the snow. ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখীর ঝড় তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

প্রিয় বন্ধু আর্থার হাল্লাম এর মৃত্যুতে শোকাভিভূত না হয়ে টেনিশন শোককে শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। Queen Victoria এই কবিতা পাঠ করে তাঁর সদ্য প্রয়াত সন্তানের মৃত্যু- শোককে ভুলে ছিলেন।

উপরোক্ত বক্তব্যে নজরুল তাঁর সমকালের মুসলিম মৌলভী-মাওলানাদের সমালোচনা করেছেন। নজরুল শুধু যে বৃদ্ধদের সমালোচনা করেছেন- তা নয়, তরুণদের মধ্যে যারা চাল-চলনে বৃদ্ধে পরিণত হয়েছেন, তাদেরকেও সমালোচনা করেছেন। বার্ধক্য ও তারুণ্যের এমন চমৎকার বিশ্লেষণ অন্য কারও রচনায় তেমন দেখা যায় না।

এরই সাথে নজরুল মুসলিম সামজের গোঁড়ামী ও কুসংস্কারকেও তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি 'কাঠ-মোল্লা' নামধারী একদল ধর্মান্ধদেরকে কষাঘাত করেছেন, যারা ধর্মের নামে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

শিক্ষিত মাওলানাদের মধ্যে মাওলানা আকরাম খাঁ নজরুলকে সবচেয়ে বেশী আঘাত করেছেন। তাঁর 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি নজরুলের কুৎসা রটনা করেছেন। তাঁকে ইসলামের শত্রুরূপে পরিগনিত করতে চেয়েছেন। মৌলভী রেয়াজউদ্দীন নামে একজন লেখকও নজরুলকে 'শয়তান' বলতেও দ্বিধা করেন নি।

এইসব তথাকথিত মুসলিম নামধারী ফতোয়াবাজ মোল্লারা ইসলামের নামে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নজরুল যুবকদের আহবান জানিয়েছেন।

নজরুল বলেন, "..... এই ফতুয়াধারী, ফতোয়াবাজদের হাত হইতে গরীবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে ত সে তরুণ ইহাদের হাতের 'আশা' বা যষ্টি মাঝে মাঝে আজদাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়া তরুণ মুসলিমদের গ্রাস করিতে আসিবে সত্যি, কিন্তু এই 'আশা' দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিলে চলিবে না। এই ঘরোয়া যুদ্ধ-- ভাই এর সহিত আত্মীয়ের সাহিত যুদ্ধই-- সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তবু উপায় নাই। যত বড় আত্মীয় হোক, তাহার যক্ষা বা কুষ্ঠ হইলে তাহাকে অন্যত্রে না সরাইয়া উপায় নাই। যে হাত বাঘে চিবাইয়া খাইয়াছে, তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রাণ রক্ষার উপায় নাই।

চোগা চাপকান দাড়ি টুপি দিয়া মুসলমান সাজিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর আর সব দেশের মুসলমানদের কাছে আজ আমরা অন্তত: পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রয়েছি।"

বস্তুত: এই অভিভাষণের মাধ্যমে নজরুল যথার্থই এক প্রকার সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে এমন জোরালো যুক্তিনিষ্ঠ ও সাহসী বক্তব্য অন্য কেউ দিতে পারে নি।

নজরুল এই ভাষণের ভেতর দিয়ে মুসলিম সমাজে নারীদের গৃহাভ্যন্তরে অবরোধ করে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। এই সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার পথকে ধর্মের নামে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইসলাম এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে কখনও সমর্থন করে না। এই ধরনের ফতোয়াবাজেরা নারীদের অবরোধের নামে তাদের শ্বাসরোধ করে প্রতিনিয়ত মেরে ফেলছে। ইসলাম কন্যার জন্মকে স্বাগত জানিয়েছে। হযরত মোহাম্মদ (দ:)এর সময় যারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়েছে আল্লাহর নবী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন-- তারা জাহান্নামী। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে। তিনি বলেছেন, সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি একজন নারী। তিনি নবী হযরত মোহাম্মদ (দ:) এর স্ত্রী ছিলেন। নজরুল দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, "খোদার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম।" অবাক হতে হয় যে ইসলামের এমন সুন্দর

ব্যাখ্যা নজরুলের পূর্বে অপর কেউতো করেন নি। সমাজের তথাকথিত মাওলানা, মৌলভী ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দান করে ইসলামকেই ধ্বংস করেছে। এরা ইংরেজী শিক্ষাকে 'কুফরী ভাষা শিক্ষা' নামেও অভিহিত করেছে। এদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তিনি তরুণদের আহবান করেছেন। এসব ধর্মান্ধদের ধ্বংসের মধ্যেই ইসলামের বেঁচে থাকার শক্তি নিহিত। এদের কারণেই মুসলমানেরা পিছিয়ে পড়েছে। ইসলামের যথার্থ জ্ঞান নিয়েই নজরুল ঘোষণা দিয়েছেন, নারী পুরুষের দাসী নয়-- সে তার অংশভাগ। তারা মর্যাদার দাবীদার। পৃথিবীর সব কল্যাণকর কাজে সে পুরুষের অংশীদার।

॥ তিন ॥

ইসলামে সঙ্গীত 'হারাম' এমন ধারণা মৌলভী, মাওলানাদের রয়েছে। পবিত্র কোরআন মজিদে সঙ্গীত হারাম এমন উল্লেখ নেই। তবে হযরত দাউদ (আ:) যখন আল্লাহর প্রদত্ত গ্রন্থ 'যাবুর' পাঠ করতেন সুমিষ্ট স্বর এবং সুরে তখন পাখী, বৃক্ষরাজী, পাহাড়-পর্বত তার সাথে সুর মেলাত এমন উল্লেখ কোরআন মজিদে রয়েছে। সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তাঁর 'যাবুর' পাঠ শুনতে আসতো। এ সময় ইহুদীরা মাছ ধরতো বলে আল্লাহ তাদের মাছ ধরতে নিষেধ করেছিলেন। তারা আল্লাহর আদেশ মানে নি বলে আল্লাহ তাদের 'বানর' এবং 'শুকর' বানিয়ে দিয়েছিলেন। কোরআন মজিদে 'শনিবারের' দিনে হযরত দাউদ (আ:) এর 'যাবুর' পাঠ বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়। তিনি সুমিষ্ট স্বরে ও সুরেলা কণ্ঠে 'যাবুর' পাঠ করেছেন। আল্লাহ কোরআন মজিদকে ধীরে ধীরে সুমিষ্ট সুরে পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। আজানের ধ্বনি সুর-পুষ্ট এবং সুমিষ্ট। আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে সে সমস্ত কবিদের তীব্র ভর্ৎসনা ও নিন্দা করেছেন যারা পাগলের মতো আচরণ করে জীবনের কল্যাণকামীতার পরিবর্তে অশালীন বিষয়কে কাব্যে প্রাধান্য দিয়েছে। হাদিসে আল্লাহ এবং মানুষের বিষয়ে কল্যাণমূলক কবিতা লিখতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি নবী মোহাম্মদ (দ:) এর সময় 'দফ' বাজানোও নিষিদ্ধ হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির গুণ-গানমূলক কল্যাণধর্মী গান নিষিদ্ধ নয়।

নজরুল তরুণদের প্রতি তাঁর অভিভাষণের একটি অধ্যায়ে 'সঙ্গীত-শিল্প' সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে নজরুল বলেন, "পৃথিবীর অন্য মুসলমান-প্রধান দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এই ভারতেরই সকল প্রদেশের আজও যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী– কি কণ্ঠসঙ্গীতে, কি যন্ত্রসঙ্গীতে-- তাহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান। অথচ সে দেশের মৌলভী-মৌলানা সাহেবান আমাদের দেশের মৌলভী সাহেবানেরা অপেক্ষা ও জবরদস্ত। তাঁহারা ঐসব গুণীদের অপমান বা সমাজচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া জানি না! বরং তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করা হয় বয়িলা জানি। সঙ্গীত শিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে, যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি-নিষেধের ওপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।"

নজরুল তরুণদের প্রতি তাঁর এই বক্তব্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতিকারী নেতৃবৃন্দের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তরুণদেরকে এইসব চরিত্রহীন নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা রাখার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন।

বস্তুত, নজরুল তাঁর কাব্য, উপন্যাস এবং ছোটগল্পে এবং তাঁর গানেও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

তাঁর 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' গানটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নিদর্শন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এই গানটিকে বাঙালীর জাতীয় সংগীত বললেও দ্বিধা করেন নি।

নিম্নে নজরুলের 'যৌবনের ডাক' অভিভাষণটির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল।

যৌবনের ডাক

নজরুল ইসলাম

আমার প্রিয় তরুণ ভ্রাতৃগণ!

দেশের, জাতির ঘন-ঘোর-ঘেরা দুর্দিনে দেশের জাতির শক্তিমজ্জা প্রাণস্বরূপ তরুণদের যাত্রা পথের দিশারী হইবার স্পর্দ্ধা বা যোগ্যতা আমার কোনদিন ছিল না, আজও নাই। আমি দেশ-কর্মী দেশ-নেতা নই, যদিও দেশের প্রতি আমার মমত্ববোধ, কোন স্বদেশ প্রেমিকের অপেক্ষা কম নয়। রাজ-লাঞ্ছনা ও ত্যাগ স্বীকারের মাপকাঠি দিয়া মাপিলে হয়ত আমি তাঁহাদের কাছে pigmy বলিয়া অনুমতি হইব, তবু দেশের জন্য অন্তত: এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি যে, দেশের মঙ্গল করিতে না পারিলেও অমঙ্গল চিন্তা কোনদিন করি নাই, যাঁহারা দেশের কাজ করেন তাঁহাদের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াই নাই। রাজ-লাঞ্ছনার চন্দন-তিলক কোনদিন আমারও ললাটে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আজ মুছিয়া গিয়াছে। আজ তাহা লইয়া গৌরব করিবারও অধিকার আমার নাই।

আমি কবি। বনের পাখীর মত স্বভাব আমার গান করার। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স-ফিঙে যখন বেচারা গানের পাখীকে তাড়া করে, তীক্ষ্ম চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আন্- গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান। সে গান করে আপনার মনের আনন্দে; যদি তাহাতে কাহারও অলস-তন্দ্রা মোহ-নিদ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্ত দৈব। যৌবনের সীমা পরিক্রমণ আজও আমার শেষ হয় নাই, কাজেই আমি যে গান গাই, তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে, তাহা আমার অগোচরে। যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায়, সে হয়ত তাহার শক্তি সম্বন্ধে আজও নাওয়াকিফ।.....

আমার একমাত্র সম্বল– আপনাদের, তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে, যৌবনকে, আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি সেইদিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, তাজিম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি। গানে, কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি, স্তব রচনা করিয়াছি।

আমি যৌবনের পূজারী, কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের এই মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম, আপনাদের দলপতি হইয়া নয়, আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই, আজ আমরা শতদিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি,এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

আপনারা যে অপূর্ব অভিনন্দন আমায় দিয়াছেন, তাহার ভারে আমার শির নত হইয়া গিয়াছে, আমার অন্তরের ঘট আপনাদের প্রীতির সলিলে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিয়াছে, সেই পূর্ণ ঘটে আর শ্রদ্ধা প্রতি-নিবেদনের ভাষা ফুটিতেছে না। আমার পরিপূর্ণ অন্তরের বাক-হীন শ্রদ্ধা-প্রীতি-সালাম আপনারা গ্রহণ করুন। আমি উপদেশের শিলাবৃষ্টি করিতে আসি নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে যাহা না বলিলে নয়, শুধু সেইটুকু বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

বার্ধক্য ও যৌবন

আমি সর্বপ্রথমে বলিতে চাই, আমাদের এই তরুণ মুসলিম সম্মেলনের কোনো সার্থকতা নাই, যদি আমরা আমাদের পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া বার্ধক্যের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিতে না পারি। বার্ধক্য তাহাই– যাহা পুরাতনকে-মিথ্যাকে মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই– যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নবমানবের অভিনব জয়যাত্রার যাহারা শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না। যাহারা জীব হইয়াও জড়, যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণ স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই– যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণ চঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাৎ করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতি-জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার– বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি– যাহাদের যৌবনের উর্দ্দির নীচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি– যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহার– যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার

ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুইনদের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালা পাহাড়ের অসিতে, কামাল করীম-মুসোলিনি-সানইয়াৎ-লেনিনের শক্তিতে। যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে– যাহারা বৈমানিকরূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারকরূপে নব পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, গৌরীশৃঙ্গ-কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়া যাহারা তুষার ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিল-সমাধি লাভ করে, মঙ্গলগ্রহে চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, পবন-গতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহারা উড়িয়া যাইতে চায়, নব নব গ্রহ নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়নমণি নিভিয়া যায়– যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তদের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি– শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্বশান ঘাটে, গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ বন্যা-পীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপার্শ্বে যখন সে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া ভিখারী সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন সে দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশের বুকে আশা জাগায়।

ইহাই যৌবন, এই ধর্ম যাহাদের তাহারাই তরুণ। তাহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই। দেশ-কাল-জাতিধর্মের সীমার উর্ধ্বে ইহাদের সেনানিবাস। আজ আমরা-- মুসলিম তরুণেরা যেন অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি– ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মূরীদ যৌবনের। এই জাতি ধর্ম-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাঁহাদের যৌবন তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাঁহাদিগকে সকল দেশের সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।

পথ-পার্শ্বের যে অট্টালিকা আজ পড় পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম, ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে, তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার দু:সাহস আছে একা তরুণেরই। খোদার দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মুনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশতী চীজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারীর মত হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইব ইহাই হউক তরুণের সাধনা।

গোঁড়ামী ও কুসংস্কার

আমাদের বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামী, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলমানের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সমাজের কল্যাণকামী যে সব মৌলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনো জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষ্যতদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন– বেনোজলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমীর আসিয়া ভীড় করিয়াছে। মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইঁহারা যে কওমের, জাতির, ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান নাই বলিয়াই ইহাদের ক্ষমা করা যায়। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেই "মন মন শা ফরীদ, বগলমে ইট!" ইহাদের নীতি "মুর্দা দোজখমে যায় য়্যা বেহেশ্‌তমে যায়, মেরা হালুওয়া রুটি সে কাম।" "দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো"– নীতি অনুসরণ না করিলে সভ্য জগতের কাছে আমাদের ধর্ম জাতি আরো লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ হইবে। ইহাদের ফতুয়া ভরা ফতোয়া! বিবি তালাক ও কুফরীর ফতোয়া ত ইহাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দুই দশ গণ্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতুয়াধারী ফতোয়াবাজদের হাত হইতে গরীবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে ত সে তরুণ ইহাদের হাতের 'আশা' বা যষ্টি মাঝে মাঝে আজদাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়া তরুণ মুসলিমদের গ্রাস করিতে আসিবে সত্যি, কিন্তু এই 'আশা' দেখিয়া নিরাশা হইয়া ফিরিলে চলিবে না। এই ঘরোয়া যুদ্ধ– ভাইএর সহিত আত্মীয়ের সহিত যুদ্ধই– সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তবু উপায় নাই। যত বড় আত্মীয় হোক, তাহার যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ হইলে তাহাকে অন্যত্র না সরাইয়া উপায় নাই। যে হাত বাঘে চিবাইয়া খাইয়াছে, তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রাণ রক্ষার উপায় নাই। অন্তরে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়াই এসব কথা বলিতেছি। চোগা-চাপকান দাড়ি টুপি দিয়া মুসলমান মাপিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর আর সব দেশের মুসলমানদের কাছে আজ আমরা অন্তত: পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। যাঁহারা বলেন, "দিনত চলিয়া যাইতেছে, পথ ত চলিতেছি", তাঁহাদের বলি, ট্রেন মোটর এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়ীতে শুইয়া দুই ঘণ্টায় এক মাইল হিসাবে গদাইলস্করী চালে চলিবার দিন আর নাই। যাহারা আগে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সঙ্গ লইবার জন্য যদি আমাদের একটু অতিমাত্রায় দৌড়াইতে হয়– এবং তাহার জন্য পায়জামা হাঁটুর কাছে তুলিতে হয়, তাই না হয় তুলিলাম। ঐটুকুতেই কি আমার ঈমান বরবাদ হইয়া গেল ? ইসলামই যদি গেল, মুসলিম যদি গেল, তবে ঈমান থাকিবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া ? যাক, আর শত্রু বৃদ্ধি করিয়া কাজ নাই। তবে ভরসা এই যে, বিবি তালাকের ফতোয়া শুনিয়াও কাহারও বিবি অন্তত: বাপের বাড়ীও চলিয়া যায় নাই এবং কুফরী ফতওয়া দেওয়া সত্ত্বেও কেহ 'শুদ্ধি' হইয়া যান নাই।

অবরোধ ও স্ত্রী শিক্ষা

আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধপ্রথা হইতেছে হিমালয়। আমাদের দুয়ারের সামনে এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে, খোদা জানেন। আমাদের বাংলাদেশের স্বল্প শিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজুবুড়ীর বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যে ভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষা পোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জমার অঙ্ক তাল সামলাইয়া চলিতে পারে না। অথচ ইঁহাদের পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশী। আর ইহাদের বাড়ীতে শতকরা আশি জন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো বায়ুর অভাবে। এইসব যক্ষ্মা রোগগ্রস্তা জননীর পেটে স্বাস্থ্য সুন্দর প্রতিভা দীপ্ত বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া ? ফাঁসির কয়েদীরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে। আমরা ইসলামী সেই অনুশাসনগুলির প্রতিই জোর দিয়া থাকি, যাহাতে পয়সা খরচ হইবার ভয় নাই।

কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ– তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা জায়া জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চির বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি যে দুঃখ, কিসের অভাব, তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উবিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না– সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে– নারী।

বৃদ্ধদের আয়ুর পুঁজিত ফুরাইয়া আসিল, এখন আমাদের তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চির-বন্দিনী মাতা-ভগ্নিদের উদ্ধার সাধন। জন্ম হইতে দাঁড়ে বসিয়া যে পাখী দুধ ছোলা খাইয়াছে, সে ভুলিয়া গিয়োছে যে সেও উড়িতে পারে। বাহিরে তাহারি স্বজাতি পাখীকে উড়িতে দেখিয়া অন্য কোনো জীব বলিয়া ভ্রম হয়। এই পিঞ্জরের পাখীর দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদার দান এই আলো বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মত হীনবীর্য সন্তানের জন্ম।

শুধু কি ইহাই ? আমাদের সম্মুখে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা, তাহার উত্তর দিতে পারে তরুণ, সমাধান করিতে পারে তরুণ। সে বলিষ্ঠ মন ও বাহু আছে একা তরুণের। সম্মুখে আমাদের পর্বতপ্রমান বাধা, নিরাশার মরুভূমি, বিধি-নিষেধের দুস্তর পাথার-- এইসব লঙ্ঘন করিয়া অতিক্রম করিয়া যাইবার দুঃসাহসিকতা যাহাদের-- তাহারা তরুণ।

সঙ্ঘ একনিষ্ঠতা

ইহার জন্য চাই আমাদের একাগ্রতা, একনিষ্ঠ সাধনা, চাই সঙ্ঘ। আজ আমরা বাংলার মুসলিম তরুণেরা যুথভ্রষ্ট। আমাদের সঙ্ঘ নাই, সাধনা নাই, তাই সিদ্ধিও নাই। আমাদের চারিপাশে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু যুবকদের দেখিতেছি– কি অপূর্ব তাদের ঐক্য, ত্যাগ, সাধনা। জগতের যে কোনো যুব আন্দোলনের সঙ্ঘকে তারা চ্যালেঞ্জ করিতে পারে। ইহারা পিতা-মাতার স্নেহ, ভাই-ভগ্নিনীর প্রীতি, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের ভালোবাসা, প্রিয়ার বাহুবন্ধন, গৃহের সুখ-শান্তি, ঐশ্বর্যের বিলাস, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোহ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে জাতির জন্য, দেশের জন্য।..... আমাদের মুসলমান হওয়া লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকুরী অর্জনের জন্য। এই যাহাদের লক্ষ্য, এত স্বল্প যাহাদের আশা, এত নিম্নে যাহাদের গতি– তাহাদের কি আর মুক্তি আছে ? চাকুরীর মোহ, পদবীর নেশা, টাইটেলের মায়া যদি বিসর্জন না করিতে পারি তবে আমাদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর পরাহত। এই ভূতকে ছাড়াইবার ওঝা আপনারা, যুবকের দল।

কোথায় আছ সেই শহীদের দল? বাহিরিয়া আইস, আজ এই মুক্ত আলোকে, উদার আকাশের নীল চন্দ্রাতপতলে! তোমাদের অস্থিমজ্জা প্রাণ দেহ, তোমাদের সঞ্চিত জ্ঞান, অর্জিত ধনরত্নের উপর প্রতিষ্ঠা হইবে আমাদের সঙ্ঘের– তরুণ সঙ্ঘের। সকল লাভ লোভ যশ খ্যাতিকে পদদলিত করিয়া মুসাফিরের বেশে ভিক্ষুকের ঝুলি লইয়া যে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে– এ সাধনা তাহারই, এ শহীদী দরজা শুধু তাহারই।

সঙ্গীত শিল্প

আমাদের লক্ষ্য হইবে এক, পথ হইবে বহুমুখী। যে দুর্ধর্ষ, সে কালবৈশাখীর কেতন উড়াইয়া অসম্ভবের অভিযানে যাত্রা করুক, যে বীর তাঁহার জন্য রহিয়াছে সংগ্রামক্ষেত্র, যে কর্মী তাহার জন্য পড়িয়া রহিয়াছে কর্মের বিপুল উপত্যকা; কিন্তু যে ধ্যানী, যে সুন্দরের পূজারী, সে কল্প পাখায় ভর করিয়া উড়িয়া যাক স্বপ্নলোকে, উদার নিঃসীম নীল নভে। সেই স্বপ্নপুরী হইতে সে যে স্বপন-কুমারীকে রূপ-কুমারীকে জয় করিয়া আনিবে তাহার লাবণীতে আমাদের কর্মক্লান্ত ক্ষণগুলি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিবে। যে গাহিতে জানে, গানের পাখী যে, তাহাকে ছাড়িয়া দিব দূরবিথার বনানীর কোলে– আমাদের আশেপাশে থাকিয়া আমাদের অবসাদ-ক্লিষ্ট মুহূর্তকে সে গানে ভরিয়া তুলিবে, প্রাণে নব প্রেরণার সঞ্চার করিবে। ইহারা আমাদের সুন্দর সাথী। বাড়ীর উঠানের ফুলে ফুলে ফুল্ল লতাটির পাণে চাহিয়া যেমন রৌদ্রদগ্ধ চক্ষু জুড়াইয়া লই, তেমনি করিয়া ইহাদের কবিতায় গানে ছবিতে আমরা আমাদের বুভুক্ষু অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইব, অবসাদ ভুলিব।

বিধি-নিষেধের বাধা আমরা মানিব না। গান গাওয়াই যাহার স্বভাব, সেই গানের পাখীকে কোন্ অধিকারে গলা টিপিয়া মারিতে যাইব? সুন্দরের সৃষ্টির শক্তি লইয়া যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কে তাহার সৃষ্টিকে হেরিয়া কুফরীর ফতোয়া দিবে? এই খোদার উপর খোদকারী আর যাহারা করে করুক, আমরা করিব না।

পৃথিবীর অন্য মুসলমান-প্রধান দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এই ভারতেরই সকল প্রদেশের আজও যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী– কি কণ্ঠ সঙ্গীতে, কি যন্ত্র সঙ্গীতে– তাঁহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

অথচ সে দেশের মৌলভী-মৌলানা সাহেবান আমাদের দেশের মৌলবী সাহেবানেরা অপেক্ষাও জবরদস্ত। তাঁহার ঐসব গুণীদের অপমান বা সমাজচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া জানি না! বরং তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করে বলিয়াই জানি। সঙ্গীত শিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে, যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি-নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।

আজ বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্রশিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে ? এই সবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া যুঝিতে হইবে। নতুবা আর্টে বাঙ্গালী মুসলমানের দান বলিয়া কোন কিছু থাকিবে না। পশুর মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড়, শ্রেষ্ঠ।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য

যৌবনের ধর্ম সঙ্কীর্ণ নয়, তাহার প্রসার বিশাল, তাহার গতিবেগ বিপুল। ধর্মের গণ্ডী বা প্রাচীরে যৌবন অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। যে ধর্মে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় তাহার প্রসারতা। এইখানেই যৌবনের গর্ব, মহত্ত্ব। নদী পর্বতে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া সে কি পর্বতের চারিপার্শ্বেই জলধারার অর্ঘ্য বহিয়া চলিবে? সে কি পর্বত-নিম্নের সমতলভূমি করুণা-সিঞ্চিত করিয়া সাগর-অভিযানে যাইবে না? যে না যায়, সে নদী নয়, সে খাল, ডোবা কিম্বা খুব জোর ঝর্ণা। আমার ধর্মের শিখর হইতে নামিয়া আমার প্রাণধারা যদি আমারই দেশের উপত্যকা ফুল-ফসলে ভরিয়া তুলিতে না পারে, তাহা হইলে আমার ধর্ম ক্ষুদ্র, আমার প্রাণ স্বল্পপরিসর। ধর্ম লইয়া বৃদ্ধেরা, প্রৌঢ়রা কলহ করে করুক, আমরা যেন এই কুৎসিৎ কলহে লিপ্ত না হই। আমার ধর্ম যেন অন্য ধর্মকে আঘাত না করে, অন্যের মর্মবেদনার সৃষ্টি না করে।

এক দেশের জলে-বায়ুতে ফলে-ফসলে, এক মায়ের স্তনে পুষ্ট হিন্দু মুসলমানে যে কদর্য্য বিরোধের সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সভ্য জগতে আমাদের সভ্য বলিয়া পরিচয় দিবার আর মুখ নাই। জননায়ক হইবার নেশায় হিন্দু-মুসলমান নেতাগণ আজ জনসাধারণকে কেবলই ধর্মের নামে উগ্র মদ পান করাইয়া করাইয়া মাতাল করিয়া তুলিয়াছেন। এই অশিক্ষিত হতভাগ্যদের জীবন হইয়া উঠিয়াছে ইহাদের হাতের ক্রীড়নক। ইহাদের অশিক্ষা ও ধর্মান্ধতাই হইয়াছে ঐসব সাম্প্রদায়িক নেতাদের হাতের অস্ত্র। যখন যেমন ইচ্ছা তখন তেমনি করিয়া ইহাদের ক্ষেপাইতেছেন। আমার মনে হয় কাউন্সিল-এসেম্‌ব্লি প্রভৃতির বালাই না থাকিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের এমন ভীষণ কদর্য মূর্তি দেখিতাম না। আজ দেখি তিনিই হিন্দুদের নেতা যিনি স-কাবাব কারণ-সলিল পান না করিয়া মায়ের নাম লইতে পারেন না। মুসলমানদেরও আজ তিনিই হঠাৎ নেতা হইয়া উঠিয়াছেন– যিনি সহ্যাম হুইস্কি পান না করিয়া ইসলামের মঙ্গল চিন্তা করিতে পারেন না। ইহাদের অর্থ আছে, তাই যথেষ্ট ভাড়াটিয়া মোল্লা মৌলবী পণ্ডিত পুরুত যোগাড় করিয়া কাগজে কাগজে ডঙ্কা পিটাইয়া স্বস্ব সম্প্রদায়ের জন্য ওকালতি করিতে পারেন। খোদার বা ভগবানেরও কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাই না। যখন মড়ক আসে, হিন্দু-মুসলমান সমানে মরিতে থাকে, আবার যখন তাঁহার আশীষধারা বৃষ্টিরূপে ঝরিতে থাকে, তখন হিন্দু-মুসলমান সকলের ঘরে সকলের মাঠে সমান ধারে বর্ষিত হয়। আমরা কেন তবে খোদার উপর খোদকারী করিতে যাই ? খোদার রাজ্য খোদা চালাইবেন, তিনি যদি ইচ্ছা না করিবেন তাহা হইলে অমুসলমান কেহ একদিনও বাঁচিতে পারিত না। সব বুঝি, সব জানি, তবু ধর্মের মুখোস পরিয়া স্বার্থের দৈত্য যখন মাতলামী আরম্ভ করে– তখন আমরাও সেই দলে ভিড়িয়া যাই। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নির্মল-বুদ্ধি মহাপুরুষদের মস্তিষ্কও তখন মায়াচ্ছন্ন হইয়া যায় দেখিয়াছি। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়– এই কুৎসিৎ সংগ্রামে লিপ্ত হয় বৃদ্ধের প্ররোচনায় তরুণেরা। আপনারা এই কদর্যতার বহু উর্দ্ধে, আপনাদের বুদ্ধি সংকীর্ণতামুক্ত, ইহাই হউক আপনাদের ধ্যান-মন্ত্র। ইসলাম ধর্ম কোন অন্য ধর্মাবলম্বীকে আঘাত করিতে আদেশ দেয় নাই। ইসলামের মূল নীতি সহনশীলতা, Passive resistance ইমাম হাসান ও হোসেন তাহার চরম দৃষ্টান্ত। আজ আমাদের পরমত সহনশীলতার অভাবে, আমাদের অশিক্ষিত প্রচারকদের প্রভাবে আমাদের ধর্ম বিকৃতির চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, আমাদের তরুণদের ঔদার্য্যে, ক্ষমায় আমাদের সেই পূর্বগৌরব ফিরিয়া আসিবে। মানুষকে মানুষের সম্মান– হোক সেযে কোনো জাতি, যে কোন ধর্ম যে কোনো সম্প্রদায়ের– দিতে যদি না পারেন, তবে বৃথাই আপনি মুসলিম বলিয়া, তরুণ বলিয়া ফখর করেন।

শেষ কথা

আমার অভিভাষণ হয়তো অভিভাষণ হইতে চলিল। আমার শেষ কথা– আমরা যৌবনের পূজারী, নব নব সম্ভাবনার অগ্রদূত, নব নবীণের নিশান বর্দার। আমরা বিশ্বের সর্বাগ্রে চলমান জাতির সহিত পা মিলাইয়া চলিব। ইহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়াইবে যে, বিরোধ আমাদের শুধু তাহার সাথেই। ঝঞ্ঝার নূপুর পরিয়া নৃত্যায়মান তুফানের মত আমরা বহিয়া যাইব। যাহা থাকিবার তাহা থাকিবে, যাহা ভাঙ্গিবার তাহা আমাদের চরণাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। দুর্যোগ রাতের নিরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত হউক আমাদের প্রাণ-প্রদীপ্তি। সকল বাধা-নিষেধের শিখর দেশে স্থাপিত হউক আমাদের উদ্ধত বিজয় পতাকা। প্রাণের প্রাচুর্যে আমরা যেন সকল সঙ্কীর্ণতাকে পায়ে দলিয়া চলিয়া যাইতে পারি।

আমরা চাই সিদ্দিকের সাচ্চাই, উমরের শৌর্য ও মহানুভবতা, আলির জুলফিকার, হাসান-হোসেনের ত্যাগ ও সহনশীলতা। আমরা চাই, খালেদ-মুসা-তারেকের তরবারী, বেলালের প্রেম। এইসব গুণ যদি অর্জন করিতে পারি– তবে জগতে যাহারা আজ অপরাজেয়, তাহাদের সহিত আমাদের নামও সসম্মানে উচ্চারিত হইবে।

সামনে: গিরিবালাদেবী ও প্রমিলা নজরুল। মাঝখানে: নজরুল ও পুত্র বুলবুল।

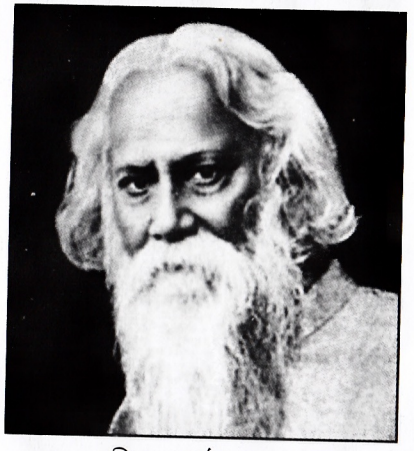

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাজী নজরুল ইসলাম

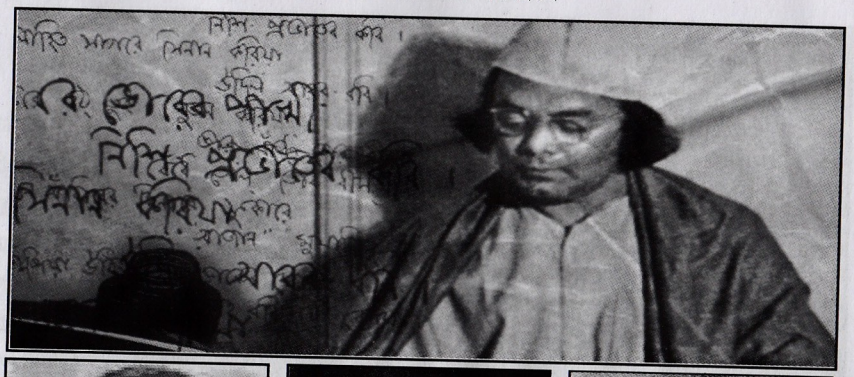

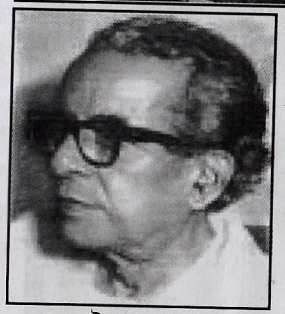

শৈলজানন্দ

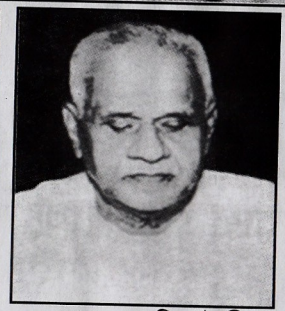

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন

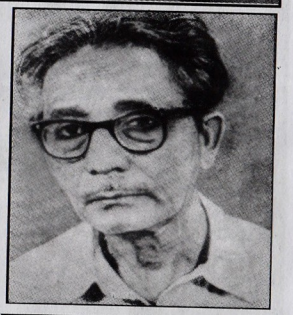

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ

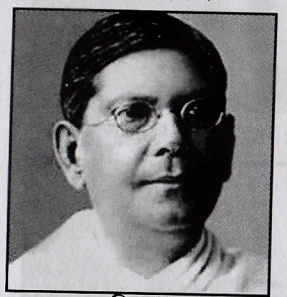

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

নেতাজী সুভাষ বসু

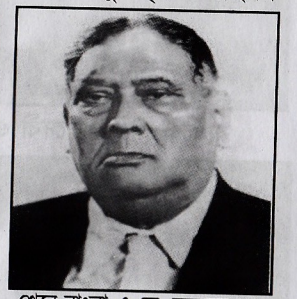

শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

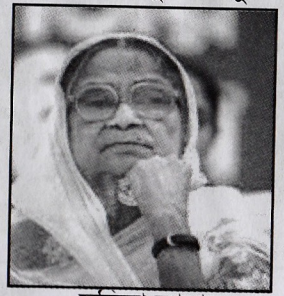

সুফিয়া কামাল

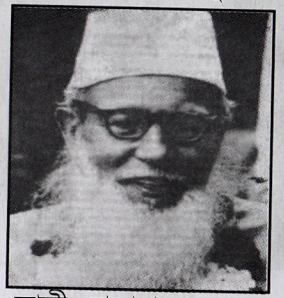

কাজী মোতাহার হোসেন

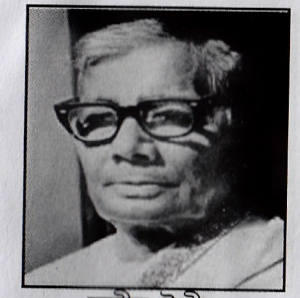

জসীম উদ্দীন

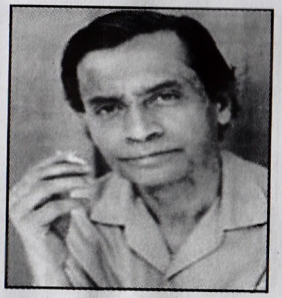

বুদ্ধদেব বসু

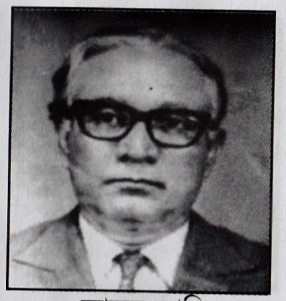

আব্দুল কাদির

দিলীপ রায়

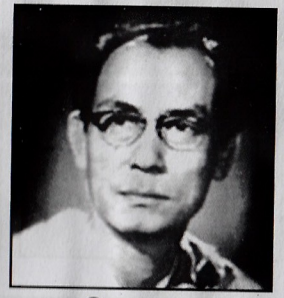

শচীন দেব বর্মণ

আব্বাস উদ্দীন

কমল দাশগুপ্ত

কানন বালা দেবী

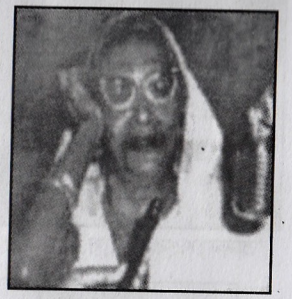

আঙ্গুর বালা

ইন্দু বালা

প্রতিভা বসু

ফিরোজা বেগম

যুথিকা

প্রণব রায়

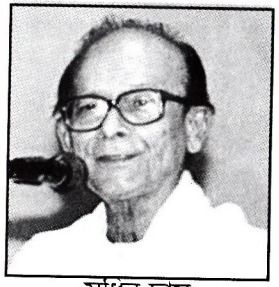
সুধীন দাস

সোহরাব হোসেন

বীরেন্দ্রনাথ

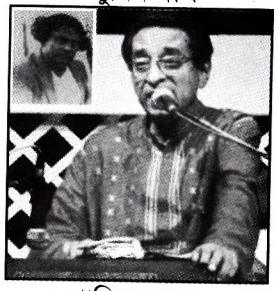
খালিদ হোসেন

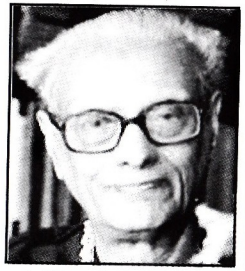
অনন্যশংকর রায়

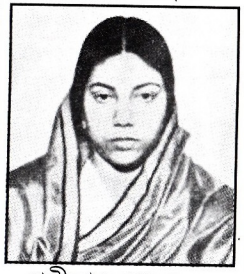
প্রমীলা নজরুল

৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের বাড়ী